International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 52-57
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.130

মনোজ বসুর উপন্যাসে প্রান্তিক জীবনের প্রতিধ্বনি

দীপান্বিতা আচার্য
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত

Received: 19.08.2025; Accepted: 22.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

When we talk about marginalized people, the image of ordinary people comes to our eyes. People who are exploited, deprived, neglected and neglected. Manoj Basu's novel 'Ban Kete Basot' talks about these people of the Bada region. Badaban is a natural playground where uprooted people cut down forests and make it a home. They come to this deep forest with the sole desire to survive after a lot of hardship. But after finding a place themselves and making it suitable for settlement, some selfish people come and occupy that place, and cheat simple people like Jagannath and cut down forests and make homes with them, and gradually these greedy people come and build buildings there. And people like Jagad again run to cut down forests and make homes. This novel shows how the upper-class people are constantly harassing ordinary people like Jagannath directly and indirectly. These ordinary people constantly struggle to survive. Not only do they have to constantly struggle with the brutal nature of the Bada region, but they also have to constantly struggle with power-hungry people. In my research article, I will try to highlight how these frustrated, confused, hopeless, and distressed people cut down forests to make a living while preserving their humanity.

Keywords: Marginalized people, Bada region, Survive, Harassing, Struggle, Humanity.

সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বাংলা সাহিত্যও এই পথের পথিক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার মধ্যে সমাজের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে জাতিভেদ প্রথা। জাতি বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয় সমাজে অনেক বছর আগের থেকেই বিরাট সংখ্যক জনগণকে উপেক্ষিত করে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে এর জন্য পিছিয়ে পরা এই মানুষগুলোর মধ্যে আর্থিক দৈন্যতা দেখা দেয় এবং তারা উচ্চশ্রেণির মানুষদের দ্বারা শোষিত হয়ে প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। মূলত প্রান্তবর্গীয় এই মানুষেরা নানা ভাবে অবহেলিত। দারিদ্র শোষণ লাঞ্ছনা এই নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চবর্গীয় মানুষদের আধুনিক জীবনযাত্রা বিলাসবহুলতা ইত্যাদি পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেই সামর্থ্য তাদের নেই। উচ্চবর্গের মানুষরা সর্বদাই তাদের অবদমিত করে রাখার চেষ্টায় থাকে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই এই নিম্নবর্গের মানুষদের কথা উঠে আসছে। বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সাহিত্যেকেরা নানাভাবে এই নিম্নবর্গের মানুষদের দুর্দশার ছবি জনসমাজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তদের প্রতিবাদী চেতনাকে জন সমক্ষে আনার চেষ্টা করেছেন প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। নিম্নবর্গের জীবন, তাদের চিন্তা তাদের মধ্যেও যে প্রতিবাদী সত্তা রয়েছে তা বিশ শতকের সাহিত্যিকেরা সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে এই চেতনা যে প্রাচীন যুগেও ছিল এই প্রসঙ্গে দেবাশিস ভট্টাচার্য তাঁর "বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা" বইটি তে বলেছেন - -

"নিম্নবর্গের মানুষ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বারবারই এসেছে। সাহিত্যে সাধারন ভাবে তারা প্রতিষ্ঠান অনুগত রূপেই চিত্রিত। প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা ও কদাচিৎ দেখা গেছে। শাসকদের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলে ও সহৃদয় কবিরা নিম্নবর্গের পাল্টা প্রত্যাখানের চেতনা জগতটিকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি।"[১]

উনিশ শতকের কথাসাহিত্য রোমান্সের কল্পরাজ্যে সমাসীন, বিশ শতক তার থেকে অনেকটাই উন্মুক্ত।[২] তাই বলা যায় যে বিশ শতকের লেখকেরা প্রান্তবর্গীয় এই মানুষদের যন্ত্রণাকে স্পষ্টতর একটা রূপ দিতে চেয়েছেন। বিশ শতকের স্বনামধন্য সাহিত্যিক মনোজ বসুর বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের সংগ্রামমুখী জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। মনোজ বসু তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে সাধারন মানুষদের কথা বলেছেন। যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন সেই পরিবেশ নিয়েই গল্প উপন্যাসের প্লট তৈরি হয়েছে।[৩]

১৯০৯ সালের ২৫ শে জুলাই মনোজ বসু জন্ম গ্রহণ করেন যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামে। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসের মধ্যে আছে দেশপ্রেম, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রকৃতি চেতনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি। শুধু বিপন্ন সময়ের কথা তিনি বলেননি, তিনি সেই সময় থেকে বেরিয়ে আসার পথও দেখিয়েছেন। তাঁর 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে কীভাবে বাদা অঞ্চলের মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্গীয় মানুষদের সঙ্গে লড়াই করে যায় তা দেখা গেছে। মনোজ বসু প্রকৃতিকে দেখেছেন অন্য দৃষ্টিতে। যেখানে অন্যান্য লেখকেরা প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পায় আনন্দ সেখানে মনোজ বসু প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে এনে তার মধ্যে একটি ব্যঞ্জনা দেয়ার প্রয়াস করেছেন।[৪] তাঁর "বন কেটে বসত" (১৯৬১) উপন্যাসটি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে রচিত। কষ্ট করে বন কেটে বসত বানানোর পর কীভাবে সাধারন এই মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম শুরু হয় তাই উপন্যাসের বিষয় বলা যায়।

প্রান্তের এই মানুষগুলো জীবন সংগ্রামের বিষয়ে জানার আগে লেখক যে অঞ্চলের কথা বলেছেন সেই অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলকে ঘিরে এই উপন্যাস গঠিত হয়েছে। যে বাদা অঞ্চলের কথা লেখক এখানে বলেছেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- "গাঙ খালের ঠাস বুনুনি। দশ পা ডাঙ্গায় হাঁটে তো বিশ পা জলে। কোথাও হাঁটু জল,আবার কোনখানে সাঁতার কাটতে হচ্ছে দস্তুর মতো। ভয় তা জলের নয় কাঁদার। নোনা কাঁদা প্রেমকাঁদা যার নাম, আঠার মতো চটচটে। পায়ে লেপটে যায়, এক একখানা ওজনে আট দশ সের হয়ে দাঁড়ায়।"[৫]

দুর্গম এই অঞ্চলে মানুষ বসতি স্থাপন করে। কারন শহর অঞ্চলে লক্ষ মানুষ আগেই বসে আছে। মানুষ দূর দুরান্ত থেকে চলে আসে শহরে। শহর কলকাতায় মানুষ পোকার মতো ভিড় করছে। কারন একটাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। শহরে আসলে টাকা পাওয়া যাবে। কাজের সন্ধানেই গগন শহরে এসেছিল। কাজের জন্যই সে শহর ছেড়ে চলে আসে বাদা অঞ্চলের দিকে। মনোহর নামের ডাক্তার একজন গগনকে কোকিলবাড়ির পথ দেখিয়েছিলেন। বাদা অঞ্চলের গ্রাম কোকিলবাড়ি, পরগণা রামচন্দ্রপুর থানা শোলাডাঙ্গা। কোকিলবাড়ির কথা প্রসঙ্গে জানা যায় সেখানে মানুষ গিয়ে ঘর বাঁধার আগে বাঘের ডাক শোনা যেত। ধীরে ধীরে সেই কোকিলবাড়ি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে ডাঙ্গার উপর বাঁধা রাস্তা,জলের উপর নৌকো ডিসি। এখন ইট দিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে। মনোহর ডাক্তারখানায় লোক গমগম করে। বাদা অঞ্চলে মানুষ এসে ভিড় করছে, যেমন করেছে কুমিরমারিতে। কুমিরমারিকে বাদার কলকাতা বলা যায়। কুমিরমারি ছিল জলকাঁদায় পূর্ণ। কয়েকবছরের মধ্যে কুমিরমারি বাদার কলকাতায় পরিণত হয়। মিঠে জলের পুকুরকে কেন্দ্র করে সেখানে পাঁচ ছয়খানা দোকান বাঁধা হয়। সপ্তাহে দুদিন করে হাট বসে। বাদা অঞ্চলের লোকজন সেখানে হাট করতে যায়। ক্রমে নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বাদাবনের দিকে। রাস্তা তৈরি হলেই কুমিরমারি ষোলো আনা শহরে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু এই কুমিরমারিই আগে ছিল জলকাঁদায় পূর্ণ। কয়েকজন মানুষ ছাড়া সেখানে কেউ থাকত না। বাদা অঞ্চলের মানুষেরা যখন বাইরের মানুষ দেখার জন্য হাঁপিয়ে উঠত তখনই চলে যেত এই কুমিরমারির হাটে। তখন ও কুমিরমারি তে সেরকম হাট বসত না। হাটের সময় কিছু দোকানপাট আর খদ্দের পত্তর এসে জমত। নৌকো না থাকলে বাদার মানুষ কাঁদা ভেঙে সাঁতরেও সেখানে চলে যেত। এই কুমিরমারি এখন ক্রমে শহর হয়ে উঠছে। ভাতের হোটেল থেকে শুরু করে ক্রমে রাস্তা নির্মাণের জন্য ইট বালুও এসে পড়েছে সেখানে। কুমিরমারি একমাত্র পয়সা খরচের জায়গা। অচেনা মানুষ জন দেখার জায়গা। জনপদের মানুষ ও আবাদের মানুষের মেলামেশার জায়গা। ক্রমে শহর ছেড়ে মানুষ চলে যায়

এইসব বাদা অঞ্চলে। টাকা পয়সা জায়গা জমি সবই ভাগ হয়ে যাচ্ছে শহর অঞ্চলে তাই এই বাদায় তারা ছুটে আসছে। বাদা অঞ্চলের দিকে ছুটে আসার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে-"বাদাবন মায়া জানে। দুবার চার বার গিয়েছ কি নেশা ধরে যাবে। তখন আর রোজগারের ধান্দায় নয়- যেতেই হবে তোমাকে, না গিয়ে উপায় নেই। বুড়ো থুথুড়ে বাওয়ালি ঘর উঠোন করতেও কষ্ট হয়- সেই মানুষটার ও দেখবে কোটরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এপারে ওপারে ঘন সবুজ বন, পাড় ভাঙছে, ঝপাঝপ কুমির নেমে পড়ছে জলে।, চরের ওপর হরিণ চড়ছে, ডালে ডালে বানর, বাঘ হামলা দিয়ে ওঠে কোথাও কোন দূরের বনান্তরালে, স্রোত ডেকে চলছে কলকল আওয়াজে। সাদা লাল গেরুয়া নানান রঙের পাল ফুলিয়ে নৌকোর বহর যাচ্ছে।"[৬] এই অঞ্চলে বসতিস্থাপন করতে আসলেও তাদের জীবনের এই সংগ্রাম যতটা কঠিন ততটা ভয়াবহ। বেশি রাত হয়ে গেলে বাদা অঞ্চলে ঢোকা কঠিন। বাঘ কুমির সেখানে তো রয়েছেই তাছাড়া রয়েছে চিন্তাথালির মতো "কালো ক্ষীরের সমুদ্র।"[৭] প্রকৃতির নির্মম ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করে চলছে বাদা অঞ্চলের মানুষেরা। মানুষেরা বন কেটে ধীরে ধীরে বসত বানায়। মানুষ আসতে আসতে বন একেবারে শেষ হয়ে যায়। যেভাবে গগন বাদাবনে প্রবেশ করেছে টাকা রোজগারের জন্য সেভাবেই মানুষ ক্রমে চলে আসছে বনে। জগন্নাথের মতো মানুষেরা কুড়াল হাতে জঙ্গল কাটে এবং বসতি নির্মাণ করে।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গগনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৌঁছে যাই বাদা অঞ্চলে। স্ত্রী বোনকে নিয়ে সংসারের ভার নিতে পারছিল না সে। তার উপর কুটুম্ব নগেনশশীর তির্যক বাক্যবাণ। গগন বেরিয়ে পরে কাজের সন্ধানে। অল্পস্বল্প পড়াশোনা জানায় শহর থেকে দূরে গাঁয়ে উকিল ভবসিন্ধুর এখানে সরকারের কাজ পায় । মিস্ত্রি মজুরের হিসাবপত্র রাখে সে। তবে কিছুদিন থাকার পর এই কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে আসে। ভবসিন্ধু উকিলের বাড়িতেই গগনের সাক্ষাত হয় কোকিলবাড়ির ডাক্তার মনোহরের সঙ্গে। গগনকে স্বজাতের পেয়ে মনোহর তাকে সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। অনেক চেষ্টা করেও এখানে তার আর কোন কাজের সন্ধান পাওয়া গেল না। দূর আবাদ অঞ্চলে পয়সাকড়ির হয়তো মুখ দেখবে এই আশায় সে চলে যায় সেখানে। ক্রমে চিন্তাথালির মতো কর্দমাক্ত জায়গা পার হওয়ার সময় তার সাক্ষাত হয় জগন্নাথ বিশ্বাস ও বলাইচন্দ্র কয়ালের সঙ্গে। বোট চালায় ভারা। এই বাদা অঞ্চলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয় তারা। তবে প্রথম সাক্ষ্যাতে গগনকে ভুল ভেবে ঠকিয়েছিল তারা। পেটের ক্ষিদে মেটানোর জন্য গগনের সঙ্গে তারা প্রতারণা করেছিল। তবে চিন্তাথালির কাঁদা পার হওয়ার জন্য গগনও তাদের কাছে নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরে নি। গগনকে অনুকুল চৌধুরির ভাগিনেয় বলে সন্দেহ করেছিল তারা এবং সেই সুবাদেই অনুকুল চৌধুরির সঙ্গে তাদের শত্রুতার ইঙ্গিতও আমরা পাই। অনুকুল চৌধুরি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগ্ননাথ বলে- "ছোট চৌধুরিমশায়ের টাকা থাকলেও কি হবে লোকটা আস্ত চামার।"[৮]

জগন্নাথ খুব কর্মঠ ব্যক্তি। জগন্নাথ সম্পর্কে লেখক বলেছেন- "নৌকার কর্তাব্যক্তি কেউ নয় জগন্নাথ- হালে বসে, বাদায় নেমে কুড়াল হাতে জঙ্গলে ঢুকে যায়। কাজের গুণে তার খাতির খুব। সকলে কথা শুনে।"[৯] গগনের আসল পরিচয় জানতে পেরে জগন্নাথ অনুশোচনায় ভোগে। গুরুলোক বলে তাকে মানে সে। গগন বাদা অঞ্চলে আসায় জগন্নাথ যেন আশার আলো দেখতে পেল। পড়াশোনা জানা একজন মানুষ বাদা অঞ্চলে এসেছে এটা যেন তাদের সৌভাগ্য। জগন্নাথ গগনকে শহরে ফিরতে দেয় না। সে বলে "ডাঙ্গা রাজ্যে মানুষ কিলবিল করে। জায়গাজমি টাকা পয়সা সকলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। একটা রোগী হল তো আট ডাক্তার আট দিক থেকে শকুনের মতো খুবলে খাচ্ছে। কী করবে তার মধ্যে গিয়ে?"[১০]

বাদা অঞ্চলেও মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে বাদা অঞ্চল শহরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। জগন্নাথ গগনকে নিয়ে আরও গভীর বাদাবনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। যেখানে এখনও মানুষ বসতি করতে পারেনি। সেখানে গিয়ে ঘেরি বানালে তাদের আর ভাত কাপড়ের চিন্তা হবে না। তাদের মতো ক্ষুধার্ত মানুষেরা গিয়ে জঙ্গলে পড়ে। সেখানে জঙ্গল তাদের পেটের ক্ষিদে মেটায়। জঙ্গলের কাঠ,গোলপাতা, ঘষা কাঁচের রঙ্গের মধু ভরা চাক। আর রয়েছে মাছ। এসব দিয়েই সেই অঞ্চলের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। নতুন অঞ্চলের দিকে জগন্নাথ তাই নিয়ে যেতে চায়। দক্ষিনের নাবাল অঞ্চলের জল নিকাশের ব্যবস্থা নেই। ধানের চাষ হবার মতো জায়গা সেখানে নেই। তবে সেখানে রয়েছে মাছ। মাছের ব্যবসা করে কাঙ্গালি চক্রবর্তী এখন চৌধুরিগঞ্জের মালিক। ব্রাহ্মন হয়েও কাঙ্গালি চক্রবর্তী ডিঙ্গি বেয়ে জাল টেনে দুর্গম এই বাদা অঞ্চলে এসেছিলেন। ছোট ঘেরি থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন তার প্রকাণ্ড বাড়ি। ফুলতলায় তাদের বিরাট মাছের আড়ত। তার ছেলেরা এখন চক্রবর্তী উপাধি ছেড়ে চৌধুরি

হয়েছে। কাঙ্গালি চক্রবর্তীর ঘেরি কাঙ্গালি বাবুর ঘেরি হওয়ার পর এখন চৌধুরিগঞ্জ হয়েছে। এই চৌধুরিগঞ্জ পার করার পর আরও দুর্গম পথ অতিক্রম করে তবে তারা এসে পৌছায় 'আলা'য়[১১]। আলার মানুষজন মাছ নিয়ে ব্যস্ত। জগন্নাথ কে দেখে সবাই খুশি কারণ সে সাতটার আগে মাছ নিয়ে পৌঁছে দিতে পারবে। মাছের ব্যবসা করেই এদের জীবন চলছে। তার থেকেও ভিতরে সাঁইতলায় জগা নতুন ঘেরি বানাতে চায়। গগনকে করতে চায় ঘেরিদার। সাঁইতলার নিমকির ভিটের উপর আলা বাঁধার কথা হল। ঘোর জঙ্গলে এই বন কেটে বসত তৈরি করবে। বিনি বউকে নিয়ে আর চারুকে নিয়ে থাকবে গগন। গগনের মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল নিজের হাতে গড়া এই বসত ফেলে আর যেন কোথাও যেতে না হয়। শীতকালের ভিতরে তারা জঙ্গল কেটে চর ঘিরে আলা বানায়। কারণ বর্ষায় সারা অঞ্চলে মাটি মিলবে না। চালাঘর তৈরি হয়। রাত হলে কেউ ডিসিতে কেউবা চালাঘরে ঢুকে পড়ে। সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এতে শীত কম লাগে আবার খাল পারে বাদার জন্তু জানোয়ার আসে না আগুনের ভয়ে।

বাদা অঞ্চলের মানুষগুলো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তৈরি করে ঘেরি। তারজন্য প্রথমে তাদের বনাঞ্চল ঘুরে উপযুক্ত জায়গা খোঁজে নিতে হয়। গগনেরাও জায়গা বের করল। ঘেরি তৈরি করল। ডিসি নিয়ে জগা আর বলাই বাদায় ঢুকে যায়। গোলপাতা আর গরানের ছিটে নিয়ে আসার জন্য। বন কাটতে লেগে যায় অনেকে। দিনের বেলায় তারা ঘুমোয় আর রাত হলেই কাজ শুরু জগার বুদ্ধিতে সেখানে মাছের ঘেরি তৈরি হয়েছে। রাতেই তাদের কাজ। মনের সুখে তারা গান বাজনাও করে আবার কিছুটা করে বাঘের ভয়ে। কেওড়া তলায় কালিতলাও তৈরি হয়। এভাবে তারা তাদের জীবন কাটাতে থাকে। ঘেরিতে যাতায়াত বাড়তে থাকে। রাত্রিবেলা কাজের মানুষ আর দিনের বেলা আড্ডা জমাবার মানুষ। গগনও বড়দা নামে পরিচিতি লাভ করে। রাধেশ্যাম পচা আরও অনেকে তাদের অনুগত সঙ্গী।

ঘন জঙ্গলে নিজেরা নিজেদের ঘেরি বানিয়ে থাকলেও তাদের জীবন সংগ্রামে বাঁধা হয়ে আসে চৌধুরিগঞ্জের লোকেরা। ছোট বাবু অনুকুল চৌধুরি, ম্যানেজার অনিরুদ্ধ, প্রত্যেকে হয়ে উঠেছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঘেরিওয়ালা সকলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ। রাতের অন্ধকারে নতুন এই ঘেরিদার মাছ চুরি করে। তবে বাদা অঞ্চলে একে চুরি বলা যায় না। মাছ মারা তাদের ব্যবসা। চৌধুরিগঞ্জের সঙ্গে তাদের বেশি সংঘর্ষ। গগনের আশা যে- "কুমিরমারির রাস্তা হয়ে গেলে লরী চলবে ফুলতলা অবধি। মাল পৌঁছানোর ভাবনা থাকবে না। দর ও পাওয়া যাবে। ঘেরিওয়ালা গগন আসায় মাছমারা রীতিমতো তাদের ব্যবসা হয়ে দাড়ায়। অন্যান্য ঘেরিওয়ালাদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে যায়। চৌধুরিগঞ্জে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায় গগনের। সেই আলার মানুষ ভাল করে কথা বলতে চায় না। জীবন সংগ্রামের এটি একটি অংশমাত্র। গোলপাতা বা মধুর ব্যবসা তখন ঠিক চলে না তাই পেটের তাগিদে তারা মাছ ধরে। আগে তারা যা ধরত নিজেরা খেত এবং পড়শীদের বিলিয়ে দিত। এখন তারা ব্যবসার কাজে লাগায়।

বাদায় দুটো দল হয়ে যায়। বলা হয়েছে "দুটো দল হয়ে দাঁড়াল। একটা চৌধুরির তরফে একটা নতুন ঘেরির।"[১৩] রাধেশ্যামের উপর হাত পর্যন্ত উঠাতে দ্বিধা করল না অনিরুদ্ধের দল। চুরিতে ধরা পরলে ঘেরির পাহারাদাররা আগে জাল রেখে মানুষকে ছেড়ে দিত। কারণ— "চুরি করে মাছ মারা যদি অন্যায় ও হয় তবু হাতে মারার বিধি নেই। ভাতে মারে জাল আটকে রেখে।"[১৪] বাদা অঞ্চলের লোকেদের এটাই অনেক বেশি শাস্তি। কারণ এতে একদিনের রোজগার মাটি হয়ে যায়। বাদা অঞ্চলের নিয়ম এই থাকলেও অনিরুদ্ধ নিয়ম ভেঙ্গে রাধেশ্যাম অন্যায়ভাবে মারা হয়। গগন গায়ে হাত দেয়। এতে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলেও জগা এতে নারাজ। জগার মধ্যে দেখা দেয় প্রতিবাদী সত্ত্বা। জগাকে দেখে অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে যে বিষম কিছু একটা চলছে জগার মধ্যে। অনিরুদ্ধ সরব হয়ে উঠে জগার বিরুদ্ধে। তাদের নৌকো না পাওয়ায় সে সন্দেহ করেছে জগাদের প্রতিশোধ নিতে বাঁধ কেটে গাঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে তারা। এভাবে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে চলছে তাদের জীবন। বন কেটে কেটে বসতি স্থাপন করেছে ঠিকই কিন্তু জীবনে চলার পথে তাদের প্রয়োজন টাকা পয়সার। সেজন্যই তাদের এই সংঘর্ষ। একপক্ষ বেশি ব্যবসা করতে থাকলেই অন্য পক্ষের লোকসান। সেখানে অবশ্যই জগাদের মত মানুষদের পিছিয়ে পরতে হয় কেননা তাদের অর্থ সামর্থ জন সামর্থ কম থাকে। তাই প্রতিপক্ষ তাদের উপর জাঁকিয়ে বসতে পারে। জগন্নাথের মতো মানুষেরা কঠিন পরিশ্রম করতে পারে। শুধু নিজের জন্য নয় আলার প্রত্যেকের জন্য সে করে। কিন্তু তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই ভবিষ্যতের চিন্তা। কারণ সে জানে ধীরে

ধীরে নতুন ঘেরিও কুমিরমারিতে পরিণত হবে। এখানের ঘেরিদারও হয়তো দলবল নিয়ে মেছোচক্কোত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কারণ এইরকমই হচ্ছে প্রত্যেকটি ঘেরিতে। এভাবে চলছিল বেশ। তারপরেই সেখানে চলে আসে গগনের স্ত্রী বোন আর শালা। বিনি বউ আর চারু আসায় আলা যেন 'গেরস্তবাড়ি'[১৫] তে পরিণত হল। লেখক বলেন -"আলা আর কি বলা, আলয় এখন পুরপুরি।"[১৬]

নগেনশশী ক্রমে গগনের কান ভরতে থাকে। জগাদের সঙ্গে তার কোনোমতেই মিলে না। এ প্রসঙ্গে নগেনের উক্তিটি উল্লেখনীয়-"শত্রু শত্রু করছ- -চৌধুরিগঞ্জের কাছে তো দণ্ডবৎ হবে না । কিন্তু চৌধুরিরা যে শত্রুতাই করুক,টাকার মানুষ-ভদ্রলোক। যত সব ছ্যাঁচড়া শত্রু যে তোমার ঘরের দুয়ারে। সুবিধে পেলেই বুকে বসে দাঁড়ি উপরাবে। তাদের ঠাণ্ডা করাটা হল বেশী জরুরী।"[১৭] নগেন এসেই সমস্ত গণ্ডগোল পাকিয়ে দিল। চৌধুরিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘেরিকে নিজের নামে করার চেষ্টায় মেতে উঠল। কষ্ট করে যে ঘেরি গগনেরা তৈরি করেছিল সেই ঘেরি জলকরের সম্পত্তি বলে উল্লেখ করা হল। যে বাদা জায়গায় কোন মানুষের নামগন্ধ ছিল না সেখানে ঘেরি তৈরির পর তার উপর দখল করার জন্য কাগজপত্রের উল্লেখ করা হল। বাদাবনের মধ্যে খেটে সকলে মিলে বাঁচবার পথ বের করল কিন্তু স্বার্থপর কয়েকজন মানুষ এসে সব তছনছ করে দিল। বাদার নিয়ম ভেঙ্গে এখন ঘেরিতে জাল ফেললে সরকারি আইন মতে কোমরে দড়ি বেধে থানায় চালান করা হয়। সাধারন মানুষদের তৈরি ঘেরি ধীরে ধীরে শহরের জালে জড়াতে থাকে। জগা বুঝে গেল এই অঞ্চলে তাদের আর জায়গা নেই। এখন তাকে পুনরায় চলে যেতে হবে নতুন ঘেরির সন্ধানে। নতুনভাবে বসতি নির্মাণের জন্য তাকে পুনরায় বন কাটতে হবে। তবে এখন আর সেখানে কোন ঘেরিদার থাকবে না। সেখানে সকলের সমান অধিকার। জগার ভাষায় -"বন কিছু রেখে দেব, তাতে বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শির চেয়ে বাঘ পড়শি ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে- আবার কোনদিন খোঁড়া নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ নায়েব, আদালতের চাপরাসি আর অনুকুল চৌধুরিরা ঢুকে পরতে না পারে। "[১৮] দেবাশিস ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেছেন- "বর্ণগত অবস্থান যাই হোক না কেন উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা যতদিন থাকবে, ততদিন বর্গ বিভাজিত সমাজের বিভিন্ন স্তরেই প্রভুত্ব/অধীনতা আর্থিক সম্পদের জটিলতা থাকবে। '[১৯]

মানুষেরা এখানে মনের শান্তির জন্য তথা পেটের চাহিদার জন্য শহর থেকে দূরে বন কেটে বসত বানায়। কিন্তু কিছু ক্ষমতাবান মানুষের প্রভাব তাদের বিভিন্ন ভাবে দাবিয়ে রাখে। অর্থ বা জনবল না থাকায় তারা প্রতিবাদের সাহস পায় না কিন্তু তারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। উপন্যাসের কিছু চরিত্রের উক্তির মধ্যে এই প্রতিবাদ ধরা পরে। জগা তাদের অধীনে কাজ করলেও তাদের আধিপত্য সে বুজতে পারে। সে বলছে "আমরা হতভাগা ওদের জাল টানি, নৌকো বাই, মাছের বোঝা মাথায় করে ছুটি, দোষঘাট হলে ঠেঙ্গানি খাই, বেশি কিছু হলে ঘার ধরে বের করে দেয়।[২০] চৌধুরিরা সেখানে উচ্চাসনে বসে আছে। যদিও জায়গাটা সরকারের কিন্তু আধিপত্য তাদের। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে জগার ভাষায় -"ঘরের মধ্যে সার্কাসের জন্তু বলে মনে হবে।"[২১] অন্যান্য প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যে অন্নদাসী সম্পর্কে লেখক বলেন- -"অকথ্য গালিগালাজ করছে চৌধুরিগঞ্জের আলার দিকে তাকিয়ে,আঙ্গুল মটকে মটকে গালি দিচ্ছে। মুখের বাক্যে রাগের শোধ হয় না তো গোড়ালি দিয়ে দুম দুম করে লাথি মারছে মাটিতে।"[২২] অনিরুদ্ধের কথাতেও ধরা পরে জগার প্রতিবাদী চেতনা "জগার ভাবভঙ্গী ভাল না। আগুনও ধরিয়ে দিতে যেতে পারে চুপিসারে এসে।"[২৩] এই প্রতিবাদ অগণিত মানুষের যারা বসত তৈরি করেছে কিন্তু এখন যাদের জায়গা নেই সেখানে। জগা বলেছে-"বন কেটে ঘেরি বানিয়েছি। খাতাও আমার বুদ্ধিতে কিন্তু আমি এখন কেউ নই।"[২৪] অনেক কষ্ট করে তারা ঘর বানিয়েছে কিন্তু এখানে পরে গেছে 'শনির দৃষ্টি'।[২৫]

উপন্যাসে লেখক যবনিকা টানেননি, তিনি সেই মানুষদের সঙ্গে পাঠকদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন নতুন বসতি স্থাপনের জন্য অন্য এক বাদা অঞ্চলের দিকে। হয়ত বসতি স্থাপনের পর পুনরায় একই দশা হবে জগাদের। কারণ যতই প্রতিবাদ করা হোক না কেন যতদিন এই ব্যবধান সমাজে থাকবে ততদিন এদের নির্দিষ্ট কোন ঠাঁই হবে না। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সোজা হয় না। তারজন্য প্রয়োজন অর্থ ও জন সামর্থ। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এর একমাত্র উপায়। ঔপন্যাসিক প্রান্তের এই মানুষদের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের কঠোর সংগ্রাম ও তাদের প্রতিবাদী চেতনাকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য,দেবাশিস। বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। পৃ-৪৮।
২। তদেব, পৃ- ৫৯।
৩। চৌধুরী, ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়)। পৃ-৩৮০।
৪। আচার্য, দেবেশ কুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। পৃ-৫০৭।
৫। বসু, মনোজ। বন কেটে বসত। পৃ-১২।
৬। তদেব, পৃ-২৮।
৭। তদেব, পৃ-১৪।
৮। তদেব, পৃ-২০।
৯। তদেব, পৃ-২৭।
১০। তদেব, পৃ-২৮।
১১। তদেব, পৃ-৬৭।
১২। তদেব, পৃ-৫।
১৩। তদেব, পৃ-৮৯।
১৪। তদেব, পৃ-৮৮।
১৫। তদেব, পৃ-১৪৩।
১৬। তদেব, পৃ-১৪৭।
১৭। তদেব, পৃ-১৯২।
১৮। তদেব, পৃ-২২৮।
১৯। তদেব, পৃ-২৪১।
২০। তদেব, পৃ-৭২।
২১। তদেব, পৃ-৮৩।
২২। তদেব, পৃ-৮৮।
২৩। তদেব, পৃ-১০।
২৪। তদেব, পৃ-১৫২।
২৫। তদেব, পৃ-১৭৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। আচার্য, দেবেশ কুমার। 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৮০০-১৯৬০)। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা
২। ক্ষেত্রগুপ্ত। 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস'। তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, কলকাতা
৩। ঘোষ, বিজিত। 'বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা'। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০০, পুনশ্চ, কলকাতা
৪। চৌধুরী, ভূদেব। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। চতুর্থ পর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৩, প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, কলকাতা
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'। পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৭। বসু, মনোজ। 'বন কেটে বসত'। প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৮ বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা.) লিমিটেড
৮। ভট্টাচার্য, দেবাশিস। 'বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা'। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১০, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা